খলিফাদের
সোনালি ইতিহাস

বইঃ খলিফাদের সোনালি ইতিহাস
লেখকঃ সাইয়্যেদ আব্দুল কুদ্দুস হাশেমি
অনুবাদক : নুর হুসাইন উমর
প্রকাশনায়ঃ হাসানাহ পাবলিকেশন

খলিফাদের সোনালি ইতিহাস

সাইয়েদ আব্দুল কুদ্দুস হাশেমি

নূর হোসাইন উমর
অনূদিত ও সংকলিত

সূচিপত্র

খেলাফতে রাশেদা

খেলাফতে বনু উমাইয়া

আব্বাসি খেলাফত

আব্বাসি খেলাফত মিশর

উসমানী খেলাফত

লেখক পরিচিতি

লেখক সায়্যিদ আব্দুল কুদ্দুস হাশেমি ১৯১১ সালের ২৬শে জুন ভারতের গোয়া শহরের পার্শ্ববর্তী মাকদুমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি সপরিবারে পাকিস্তানে চলে যান। তার পিতা মাওলানা আওসাত হোসাইন ছিলেন একজন বড়ো আলেম। ছিলেন বিখ্যাত আলেম মাওলানা নাজির হোসাইন মুহাদ্দিসে দেহলবি রহমতুল্লাহি আলাইহির ঘনিষ্ঠ শিষ্য।

আব্দুল কুদ্দুস হাশেমি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন তার পিতা ও খালার কাছে। আট বছর বয়সে তার পিতার ইন্তেকাল হলে তাকে হিন্দু পাঠশালায় ভর্তি করানো হয়। সেখানে তিনি হিন্দি ভাষা ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর তিনি গোয়া শহরে আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে আরবি ভাষার প্রাথমিক কিতাবাদি পড়ার পাশাপাশি পূর্ণ কুরআন শরিফের তরজমা শেষ করেন।

পরে তিনি আজমগড় আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে আশরাফ আলি থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরেদ আব্দুর রহমান আবু নুমানের তত্ত্বাবধানে দরসে নেজামি সমাপ্ত করেন।

তারপর তিনি নদওয়াতুল উলামায় ভর্তি হন। সেখানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তাকমিল (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন।

নদওয়ায় পড়াকালে তিনি মাওলানা হায়দার হাসান খান মুহাদ্দিসে টোংকি, শামসুল উলামা মাওলানা হাফিজুলাহ শাগির ও মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গিমহল্লি থেকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি একাধারে আরবি, উর্দু, হিন্দি, ফারসি, তুর্কি ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন উঁচু মানের আলেম ছিলেন, অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লেখক ও গবেষক ছিলেন। পাকিস্তানের বিখ্যাত নাদিম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও ছিলেন।

তিনি বিশ্বের অনেকগুলো দেশ সফর করেন, দীর্ঘদিন তিনি মু’তামার আলমে ইসলামির কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলি : তাকবিমে তারিখি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। এ ছাড়া তিনি মুখতাসার তারিখে খেলাফতে ইসলামিয়া, মায়াশিয়াত আওর পাকিস্তান, হামারা রসমুল খত, সফরনামায়ে চীন ও পাকিস্তান আওর হিন্দুস্তানসহ আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

অনুবাদক ও সংকলক-পরিচিতি

নূর হোসাইন উমর।

একাধারে একজন কবি, লেখক ও অনুবাদক।

তার জন্ম বাংলাদেশের অন্তর্গত সীমান্তবর্তী জেলা নেত্রকোনা'র ছায়া সুনিবিড় কাউপুর গ্রামে।

তিনি কওমি মাদরাসা থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে আরবি সাহিত্য ও ইফতা বিভাগে পড়াশোনা করেন।

লেখালেখি তাঁর নেশা। অধ্যয়ন ও গবেষণায় ইসলামি ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয় ।

বর্তমানে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া মালনী নেত্রকোনাতে মুহাদ্দিস হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

কবিতা, অনুবাদ ও মৌলিক রচনার পাশাপাশি তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে বাংলা বিভাগে পড়াশোনা করছেন।

হাসানাহ পাবলিকেশন থেকে **‘সীমান্তের মহাবীর’** নামে তার অনূদিত একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলন প্রসঙ্গে কিছু কথা

বইটির প্রথম মুদ্রণ ছিল সায়্যিদ আবদুল কুদ্দুস হাশেমি বিরচিত ‘মুখতাসার তারিখে খেলাফতে ইসলামিয়া’ গ্রন্থের অনুবাদ।

ইসলামি খেলাফতের সামগ্রিক ইতিহাস ও সমস্ত খলিফার জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে এক মলাটে লিপিবদ্ধ হওয়ায় বইটির প্রতি মানুষের আগ্রহ ও চাহিদা ছিল ব্যাপক। ফলে অল্প দিনেই বইটির প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যায়।

তবে হ্যাঁ, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উসমানি খেলাফতের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ পর্যন্ত ১০১ জন খলিফার জীবনী ও তাদের খেলাফতকালের ঘটনাপ্রবাহ আলোচনার জন্য বইটি ছিল তুলনামূলক অনেক ছোটো কলেবরের।

ফলে পাঠকদের পক্ষ থেকে বইটির কলেবর বৃদ্ধির জন্য বারবার তাগাদা আসতে থাকে। প্রকাশক মুহতারাম রাশেদুল আলম ভাই আমার কাছে পাঠকদের চাহিদার কথা ব্যক্ত করেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবেও কলেবরের সীমাবদ্ধতা অনুভব করি। ছোট্ট কলেবর হওয়ায় খেলাফতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনা ও ইসলামি ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ও বিজয়াভিযানের আলোচনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেখকের কলম থেকে ছুটে গেছে।

কলেবর ছোটো রাখতে গিয়ে মূল লেখক সোনালি যুগ ও পরবর্তী যুগের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর কেবল নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। খলিফাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও খুব বেশি আলোচনার প্রয়াস পাননি।

ফলে আমি পাঠকদের চাহিদা, প্রকাশকের তাগাদা ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে আল্লাহর নামে সংকলনের কাজ শুরু করি এবং মূল লেখকের পক্ষ থেকে ছুটে যাওয়া বিষয়গুলোর ওপর সবিশেষ আলোচনা করি।

আমি ‘খলিফাদের সোনালি ইতিহাসের’ মলাটে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ, ইসলামি বিশ্বের অগ্রগতি ও মুসলিম সেনাপতিদের বিজয়াভিযানের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে আনার চেষ্টা করি। পাশাপাশি খলিফাদের ব্যক্তিগত জীবনাচার সমন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করি।

প্রথম মুদ্রণের পর কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, যার কারণে সংকলনের পাশাপাশি আমি মূল লেখকের অংশটুকু গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির সাহায্যে নিরীক্ষণ করি। ফলে মূল বইয়ের মূল লেখকের অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ভুল সংশোধন করা হয়।

মূল লেখক কর্তৃক কোনো কোনো খলিফার জীবনী অতি সংক্ষিপ্ত থাকার কারণে আমি নতুন করে তাদের জীবনী ও তাদের খেলাফতের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করি।

সংকলন ও অনুবাদে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে কোনো কোনো জায়গায় মূল বইয়ের কিছু অংশ আগপিছ ও কাটছাঁট করতে হয়েছে। মূল লেখক খলিফা মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী উল্লেখ করেননি। সংকলনে আমি তাঁদের জীবনী ও তাঁদের খেলাফতকালের ঘটনাবলি সংযোজন করি।

অবশেষে আল্লাহর রহমতে সংকলনের কাজ শেষ হয়।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও কলমের দৈন্যতার কারণে কোনো ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তথাপি পাঠক বরাবর নিবেদন, কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আপনারা লেখক/প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

অনুবাদ ও সংকলন সমাপ্তির পর আমি বলব,

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস ও খেলাফতে রাশেদা থেকে উসমানি খেলাফতের শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক ইতিহাস জানার জন্য এই বইটি সব ধরনের পাঠকের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হবে। বিইযনিল্লাহ।

নূর হোসাইন উমর

২৯/ ১১/২০২১ ই.

নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ

ডক্টর ইনামুল্লাহ খান সাহেবের বাণী

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইসলামের খলিফাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইসলাম ধর্মে প্রকৃত নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যাঁকে সকল কাজে, সকল ক্ষেত্রে বিনা শর্তে অনুসরণ করা সকল মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রকৃত পথপ্রদর্শক ও একচ্ছত্র নেতা বলা যায় না। তিনি ছাড়া অন্য কারও সব কাজ ও সব কথা বিনা শর্তে অনুসরণ করা যায় না।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আলমে ইসলামে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়-যা উম্মতকে সত্য ও ন্যায়ের দুধশুভ্র পথে পরিচালিত করবে। ভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতার ধূলিধূসরিত পথ থেকে হেফাজত করবে। সেই সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধিনিষেধ কার্যকর করবে।

এই মহান কাজ সমাধা করার জন্যে নক্ষত্রতুল্য সাহাবিরা ঐকমত্য হয়ে হযরত আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করেন এবং তাকে খলিফাতু রাসুলিল্লাহ অভিধায় ভূষিত করেন। এভাবেই খেলাফতব্যবস্থার সূচনা হয়। অতঃপর তা ১৩৩১ বছর পৃথিবীর বুকে আলমে ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৩৪২ হিজরি মোতাবেক ১৯২৪ সালে তুর্কি নেতা মুস্তফা কামাল পাশার হাতে চাঁদ-তারাখচিত পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়। চিরকল্যাণী খেলাফতব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আলমে ইসলামের গৌরবের যুগে এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের পতনের যুগে খেলাফতই ছিল মুসলমানদের একমাত্র মারকাজ।

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্যে, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধনের জন্যে খেলাফত ছিল একটি সুমহান শক্তি। সম্মোহনী পতাকা। যতদিন পর্যন্ত এই পতাকা উড্ডীন ছিল, ততদিন তা আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের পাশাপাশি ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

যখন খেলাফতব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল, তখন আলমে ইসলামের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা পরামর্শ করলেন। তারা মুসলমানদের একতা রক্ষার জন্যে ও খেলাফত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১৩৪৪ হিজরি মোতাবেক ১৯২৬ সালে

মক্কায় হজের মৌসুমে মু’তামার আলমে ইসলামি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

সেসব বরেণ্য ব্যক্তিদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন সাইয়েদ সুলাইমান নদভি, মোহাম্মদ আলি জাওহার, রাশিয়ার মুসা জারিল্লাহ। মিশরের মুহাম্মদ আলি আলাবি পাশা ও রশিদ রেজা। ইন্দোনেশিয়ার সাইদ উমর।

আলহামদুলিল্লাহ, ‘মু’তামার আলমে ইসলামি’ এখনো বিদ্যমান আছে। পাকিস্তানের করাচিতে এর সদর দপ্তর। পাকিস্তান ছাড়াও বিশ্বের ৬২টি দেশে এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। তারা মুসলমানদের ঐক্যের জন্যে, হারানো খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আমি প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক, সুখ্যাত লেখক ও মু’তামার আলমে ইসলামির সদর দপ্তরের ডাইরেক্টর মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল কুদ্দুস হাশেমিকে ইসলামি খেলাফতের পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। যার মাধ্যমে খলিফাদের সমুজ্জ্বল ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি বিশেষ উদ্দেশ্যে ছড়ানো কতক ইতিহাসবিদের মিথ্যা তথ্যেরও অবসান হবে।

তা ছাড়া ইতিহাসের বড়ো বড়ো কিতাব পড়ার সময় ও সুযোগ সবার দ্বারা হয়ে ওঠে না। দীর্ঘ দীর্ঘ বইয়ের দীর্ঘ ফিরিস্তি স্মরণ রাখাও অনেকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই এই সংক্ষিপ্ত বইয়ের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক সর্বোপরি সকল ইতিহাস অন্বেষীদের উপকার হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, এই কিতাব প্রস্তুত হয়ে এখন প্রকাশের পথে। আমাদের প্রার্থনা হলো, এর মাধ্যমে যেন মানুষের মাঝে ইতিহাস জানার আগ্রহ তৈরি হয়। তারা যেন বড়ো বড়ো কিতাব থেকে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী হয়।

করাচি

১ জিলকদ, ১৪০১ হি.

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ ইসায়ি

লেখকের কথা

আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত এই ছোট্ট বইটি খলিফাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এটি কোনো দীর্ঘ ও বিস্তারিত ইতিহাস নয়। এই বই রচনার একটি উদ্দেশ্য হলো-এটি পড়লে বৃহৎ কলেবরের বইগুলোতে খলিফাদের নাম ও উপাধি, তাদের যুগ ও কীর্তির ইতিহাস খুঁজে পেতে অনেক সহজ হবে। আর যাদের কাছে ইতিহাসের বৃহৎ কোনো গ্রন্থ নেই, এই বইটি তাদেরকে খুব দ্রুত ও সহজে ১১ হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি পর্যন্ত খলিফাদের স্বর্ণালি যুগ সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচনের মাধ্যমে খেলাফতে ইসলামিয়ার সোনালি ধারা শুরু হয়, যা ১৪৩১ বছর পর্যন্ত গৌরব ও সম্মানের সাথে, সুকীর্তি ও মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর ১৪৪২ হিজরিতে মুস্তফা কামাল পাশা উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদকে বরখাস্ত করে আলমে ইসলামের মারকাজ তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই সুদীর্ঘ সময়ে খেলাফত কখনো শক্তিশালী ছিল, কখনো দুর্বল, কখনো-বা নামসর্বস্ব ছিল। তবে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও মুসলমানরা এই খেলাফতকে তাদের মারকাজ মনে করত।

গত কিছুদিন যাবৎ অনেক আলিম ও গুণীজনদের থেকে আমাকে খেলাফত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। তাই আমার প্রিয় ও সম্মানিত বন্ধু মু'তামার আলমে ইসলামির সচিব ডক্টর ইনামুল্লাহ সাহেব আমাকে খলিফাদের ইতিহাস নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বই লেখতে তাগাদা দেন। যাতে আহলে ইলম হযরতদের এবং জ্ঞানপিপাসু ছাত্র ভাইদের বিশেষ উপকার হয়। আলহামদুলিল্লাহ বইটি রচনা হয়েছে। এখন প্রকাশনায় যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন বইটিকে সকলের জন্য উপকারী ও ফলপ্রসূ করেন।
ওয়ামা তাওফিকু ইল্লা বিল্লাহ।

আব্দুল কুদ্দুস হাশেমি
দক্ষিণ নাজিমাবাদ, করাচি, ৩৩
১ মহররম, ১৪০১ হিজরি; ৯ নভেম্বর ১৯৮০ ইসায়ি

অনুবাদকের কথা (প্রথম সংস্করণ)

১

ইতিহাস জাতির দর্পণ। জাতির সফলতা ও ব্যর্থতার প্রমাণ। আমাদের ইতিহাস গৌরবের। আমাদের অতীত সৌরভের। আমাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় সাহস আর শৌর্যের গল্প। আমাদের অতীতের খাতায় খাতায় বিজয় আর বীরত্বের গল্প।

প্রিয়তম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী ও শ্রেষ্ঠ মহামানব। পৃথিবীতে এই শ্রেষ্ঠ মানবের স্পর্শ যাঁরা পেয়েছেন, এই সুরভিত গোলাবের সংস্পর্শে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাই হয়েছেন ধন্য। হয়েছেন পৃথিবীর বুকে অনন্য।

১১ হিজরিতে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। তাবৎ পৃথিবী শোকে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। আলমে ইসলামে তখন এক পাহাড় বিপর্যয় নেমে এলো। তখন মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্যে একজন খলিফা নির্বাচন করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে নক্ষত্রতুল্য সাহাবিরা পরস্পর পরামর্শ করে হযরত সিদ্দিকে আকবর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করলেন।

কারণ, তিনি একদিকে যেমন সরদারে কায়েনাতের স্পর্শধন্য, অন্যদিকে তিনি মুসলিম উম্মাহর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্য। সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর রা. মুসলিম উম্মাহর খলিফা নির্বাচিত হন। তখন থেকেই খলিফাদের হিরণ্ময় কাফেলার যাত্রা শুরু হলো। শুরু হলো খলিফাদের সোনালি ধারা। যাঁদের একেকজন একেকটি নক্ষত্র, একেকটি সেতারা।

২

খেলাফত হলো আলমে ইসলামের একমাত্র মারকাজ। মুসলমানদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষার জন্যে, ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষার জন্যে খেলাফত আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা নেয়ামত। পৃথিবীর বুকে যতদিন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন আমাদের পতাকা ও নিশান উন্নত ছিল। আমাদের সম্মান ও গৌরব সমুন্নত ছিল।

১১ হিজরিতে খলিফাদের যে নক্ষত্র-মিছিল শুরু হয়েছিল, ১৩৪২ হিজরিতে এসে সে মিছিল থমকে দাঁড়াল। কুচক্রী কামাল পাশার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে ইসলামি খেলাফতের পতন হয়ে গেল। ফলে আমাদের পতাকা ও নিশান ভূলণ্ঠিত

হলো। উম্মাহর ব্যথা ও বেদনায়, বিপর্যয় ও যাতনায় সদা জাগ্রত থাকা ইস্তাম্বুলের শেষ কেল্লাও মাটিতে মিশে গেল। আমরা আমাদের মাকসাদ ও মারকাজ হারালাম। আমাদের মুহাফেজ ও অভিভাবক হারালাম।

আমাদের পবিত্র খেলাফত পতনের মধ্য দিয়েই শুরু হলো জাতীয়তাবাদের বিভৎস মিছিল। তখন আমরাও অন্ধকারের দিকে হাঁটতে থাকলাম। সোনালি ইতিহাস ও বর্ণালী ঐতিহ্য ভুলতে লাগলাম। ইহুদি-নাসারাদের ষড়যন্ত্রের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আমারও রাষ্ট্র-মূর্তির সামনে অবনত হতে লাগলাম। আমরা ভুলে গেলাম আমাদের গৌরবময় অতীতের কথা। ভুলে গেলাম আমাদের ঐক্য ও একতার কথা। সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা। ফলে অপমান আর লাঞ্ছনা আমাদের সঙ্গী হলো। পরাজয় আর জিল্লতি আমাদের ভাগ্যে জুটল। অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হয়েও আমরা কী হারালাম? কী হলো আমাদের। কী হলো আবু বকর-উমরের উত্তরসূরিদের। কী হলো খালিদ, তারিকের বংশধরদের। সালাউদ্দিন আর আল্প আরসালানের মানসসন্তানদের? এই যে আমাদের পতন। অবিশ্বাস্য অধঃপতন। এসবের শেষ কোথায়? আমাদের গন্তব্য কোথায়? একঝাঁক প্রশ্ন এসে করাঘাত করে মনের অলিন্দে। হৃদয়ের দরোজায়।

৩

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পাকিস্তানের স্বনামধন্য আলিম, লেখক ও গবেষক সাইয়েদ আব্দুল কুদ্দুস হাশেমি বিরচিত 'মুখতাসার তারিখে খেলাফতে ইসলামিয়া' গ্রন্থের সাবলীল অনুবাদ।

আবু বকর রা. থেকে শুরু করে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ পর্যন্ত খলিফাদের সোনালি ইতিহাসের গল্পকথা, তাঁদের সাহস ও বীরত্বের রক্তগাথা বিরচিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে।

আমি অবগত আছি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও কলমের দৈন্যতা সম্পর্কে। তবুও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্যে, মুমিন-মুসলমানদের উপকারের জন্যে আমি গ্রন্থটি অনুবাদ করেছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি লেখকের ধারা, তথ্য ও বর্ণনাভঙ্গিকেই অনুসরণ, অনুকরণ করেছি। যে সকল খলিফা একবার বরখাস্ত হয়ে পুনরায় খলিফা হয়েছেন, লেখক তাদের আলোচনাকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেননি। লেখক কোথাও কোথাও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ অনুল্লেখ রেখেছেন। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী তারিখ

সংযোজনের চেষ্টা করেছি। লেখকের প্রশংসা না করলেই নয়। তাঁর রচনায় ভাষার লালিত্য ও শব্দের কারিশমা, ঘটনার গতিময়তা ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতা সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

লেখক উসমানি খেলাফতের আলোচনা করতে গিয়ে তাদের বীরত্বপূর্ণ অতীত ইতিহাস আঁকতে চেয়েছেন। উসমানি সালতানাতের প্রথম দিককার যে সকল সুলতান খলিফা ছিলেন না, তাদের আলোচনাও তিনি এনেছেন। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার ও গভীর বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ফলে সুলতান উসমান ও উরখান গাজির আকাশ আকাশ সাহসের কথা, সুলতান মুরাদ ও বইজিদের পাহাড় পাহাড় বীরত্বের কথা পাঠক সহজেই জানতে পারবে। সেই সাথে জানতে পারবে সেই উলুল আমর মুজাহিদ মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কথা। ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে ও সাহসের কালিতে লেখা আছে যার গর্বগাথা। এ ছাড়াও পাঠক খলিফা ছিলেন না এমন আরও কয়েকজন উসমানি সুলতানের গৌরবময় ইতিহাস জানতে পারবে।

৪

আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানরা আজ পৃথিবীর দেশে দেশে সীমাহীন নির্যাতিত। আমাদের চোখের সামনে আরাকান, কাশ্মীর ও সিরিয়ায় আমাদের বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত। আমাদের চোখের সামনে ফিলিস্তিন উইঘুর ও বসনিয়ায় আমাদের ভাইদের আপাদমস্তক রক্তে রঞ্জিত। যেখানে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বীরত্ব আর দুঃসাহসিকতায় ভরপুর! যেখানে আমাদের পৌরুষ ও আত্মমর্যাদা বিজয় আর প্রতিশোধের নেশায় মাতাল-প্রায়! সেখানে আজ আমরা নির্যাতনের মুখেও নীরব ও নিস্পৃহ! সেখানে আজ আমরা অপমানের সম্মুখেও নির্জীব ও নির্বিকার। খলিফাদের এসব ইতিহাস পড়ে, সাহস ও বীরত্বের গল্প জেনে যদি কোনো একজন যুবকের ঈমানে চেতনার ঝড় ওঠে, হৃদয়ের পাটাতনে প্রতিশোধের অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্টি হয়, যদি কোনো একজনের হৃদয়ে শাহাদতের তামান্না জাগে, কোনো একজন খেলাফত প্রতিষ্ঠার সমুজ্জ্বল স্বপ্ন বোনে, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

নূর হোসাইন উমর (০৫/ ০১/ ২০২০)

নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ

ইসলামি খেলাফত

খলিফা ও খেলাফত শব্দ দুটি হলো আরবি। এর আসল অর্থ হলো স্থলাভিষিক্ত হওয়া। খলিফা শব্দটি কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে খেলাফত বলা হয় এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে, যা সকল মুসলমানের কাছে কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে। চাই এই কেন্দ্রটি অত্যন্ত শক্তিশালী হোক কিংবা অত্যন্ত দুর্বল হোক। এই কেন্দ্রের মহাপরিচালককে বলা হয় খলিফা। যিনি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ও আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা ও প্রতিনিধি।

সর্বপ্রথম দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক রা. নিজের জন্য আমিরুল মুমিনিন শব্দটি চয়ন করেছিলেন। এরপর থেকে সকল খলিফাই আমিরুল মুমিনিন উপাধি ব্যবহার করতে থাকেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর যখন হযরত আবু বকর রা. খলিফা হন, তখন মুসলমানরা তাঁকে খলিফাতু রাসুলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাসুলের খলিফা বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। তারপর হযরত উমর রা. যখন খলিফা হন, তখন লোকেরা তাঁকেও খলিফাতু রাসুলিল্লাহ অভিধায় ভূষিত করে।

সহসা একদিন হযরত উমর রা. বললেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা নই; বরং হযরত আবু বকর রা.-এর খলিফা। আল্লাহর রাসুলের খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন আবু বকর রা.। আর আমি আবু বকর রা.-এর স্থলাভিষিক্ত। তাই শুদ্ধ ও সুন্দর কথা হলো, সঠিক ও ন্যায়ানুগ কথা হলো, তোমরা সবাই মুমিন আর আমি তোমাদের আমির।' এভাবেই আমিরুল মুমিনিন উপাধি ব্যবহার শুরু হয়। তারপর মানুষের কাছে এই শব্দটা অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের কাছে এই অভিধা মধু মধু লাগে। তারা তা এতই পছন্দ করে যে, পরবর্তী সকল খলিফা এই অভিধায় অভিষিক্ত হতে থাকেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর ইয়াসরিবে মদিনা নামে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। এই রাষ্ট্র বংশীয় একতার ভিত্তিতে কিংবা জাতীয়তাবাদের চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা হয়নি। এমনকি মহা মহা বিজয় ইতিহাসের মাধ্যমেও এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়নি।

তখন আরবে ছিল শত শত গোত্রের বসবাস। তাদের মাঝে ঐক্য ও একতার, সংহতি ও সমতার লেশমাত্রও ছিল না। তাই বংশীয় একতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে-এ কথার ধারণাও করা যায় না।

তা ছাড়া জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথাও বলা যায় না। কারণ, আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই যে, মদিনা রাষ্ট্রে অনারবি সাহাবিদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। অনেকেই ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রিয় থেকে প্রিয়তর। ছিলেন রাসুলের ঘনিষ্ঠ সহচর।

শুহাইব রুমি রা., সালমান ফারসি রা. ও বেলাল হাবশি রা. তাঁদের মর্যাদার কথা, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বজনবিদিত। স্থানীয় অসংখ্য আরবদের থেকে, মক্কা ও মদিনার অনেকের থেকে তাঁরা ছিলেন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্বে ঊর্ধ্বে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে রোমের কায়সারের কাছে ও ইরানের কিসরার কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। চিঠি পাঠিয়েছিলেন হাবশার নাজাশিসহ আরও অনেক শাসকের কাছে। তা ছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বলতেন যে, অনারবদের ওপর আরবদের কিংবা অরবদের ওপর অনারবদের বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। তাই এ কথা বলার সুযোগ থাকেনি যে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বংশীয় একতায়। মদিনা রাষ্ট্র উদ্ভাসিত হয়েছে জাতীয়তাবাদের চেতনায়।

আমরা লক্ষ করলে দেখি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর জানেসার সাহাবিরা যখন মক্কা থেকে মদিনা আসেন, তখন তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বিজয়ীর বেশে মদিনায় প্রবেশ করেননি। তাঁরা এসেছেন মেহমান হিসেবে। বরিত হয়েছেন মেহমানের মর্যাদায়। এসেছেন হিজরতকারী হিসেবে। আশ্রয় পেয়েছেন হৃদয়বানদের শামিয়ানায়। আগত মুহাজির সাহাবিদের সংখ্যাও ছিল মদিনাবাসীদের তুলনায় নগণ্য। তাদের সাথে অন্য ও বস্ত্র ছিল না। ছিল না সহায় ও সম্পত্তি। ছিল শুধু ঈমানের মহা দৌলত। ছিল হেরার ঐশ্বরিক জ্যোতি।

তা ছাড়া যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, তখন মদিনা রাষ্ট্রের পরিধি ৯ লক্ষ সাতাইশ হাজার বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে মক্কা, খায়বার ও ছোটো ছোটো কিছু এলাকা ছাড়া বড়ো কোনো ভূখণ্ড বিজয় হয়নি। ৯ লক্ষ সাতাইশ হাজার বর্গমাইল এলাকার মাঝে বিজয় করা এলাকা ছিল মাত্র তিন হাজার বর্গমাইল।

সুতরাং এ কথা কিছুতেই বলা সংগত হবে না যে, ইসলামি রাষ্ট্র যুদ্ধ ও বিগ্রহের মাধ্যমে, তলোয়ার ও বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মদিনা রাষ্ট্র আল্লাহর প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের সামান্য প্রতিদান, যা দান করেছেন মহান প্রভু। আল্লাহ সুবহান। আর রাজত্ব ও সাম্রাজ্য এমন মহান কোনো বিষয় নয় যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এটাকে প্রভুর পক্ষ থেকে মহান দৌলত ভাববেন। রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য হলো কুরআন-প্রদর্শিত পথে আদল ও ইনসাফ, শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করা। অনিবার্য সাম্য ও মানবতার সুমহান পতাকা উড্ডীন করা।

আর যখন মুসলমানদেরকে কোনো রাজত্ব দান করা হয়, রাজ্যের মালিক বানানো হয়, তখন তাদের ওপর আবশ্যক হয়ে যায় নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, সৎ ও কল্যাণময় কাজের আদেশ করা, অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা। ফলে একটি রাষ্ট্র বড়ো একটি উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম তো বটেই, কিন্তু এটা সত্তাগতভাবে মহা দৌলত নয়।

যুগে যুগেই পৃথিবীর ভূখণ্ডে ভূখণ্ডে রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে। ব্যক্তি থেকে পরিবার। পরিবারে পরিবারে সমাজ। আবার সমাজ ও সমাজের মেলামেশায়, ঐক্যের ভিত্তিতে ও কল্যাণের নিমিত্তে গড়ে ওঠে স্টেট বা রাষ্ট্র। ধীরে ধীরে নবগঠিত রাষ্ট্রের পতন ত্বরান্বিত হয়। পরিশেষে ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

দশ বছরের অল্প সময়ের মাঝে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু-ধরনের বিশেষত্বের অধিকারী। একদিকে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির সুমহান দৌলতে ধন্য মহানবী, অপরদিকে তিনি নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান কার্যনির্বাহী।

প্রকৃত কার্যনির্বাহী ও ক্ষমতার মালিক তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির ধারক ও বাহক। তাঁর বিধিবিধান বাস্তবায়নকারী মহানবী ও শাসক।

এটা সূর্যের মতো সুস্পষ্ট যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম বিশেষত্বে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কল্পনা করাও চরম বোকামি। কারণ, সকল সাহাবি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন। সর্বশেষ নবী। ওহি আগমনের জ্যোতির্ময় ধারা, আল্লাহর বাণী অবতীর্ণের বরকতময় ফোয়ারা তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন কেউ নবী

হওয়ার কল্পনা তো করতেই পারে না। সেই সাথে এমন বিশেষত্বের অধিকারীও কেউ হতে পারে না যে, তাঁর সকল আদেশ বিনা শর্তে মান্য করা ওয়াজিব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অর্থ ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিশেষত্বের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। মদিনা রাষ্ট্রের শাসক হওয়া।

আর তখন এমন একজন নেতার তীব্র প্রয়োজনও ছিল যিনি উম্মতে মুসলিমার মাঝে আল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়নে প্রধান অফিসারের ভূমিকা পালন করবেন।

হযরত আবু বকর রা. খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেই এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে-

'ভাইয়েরা আমার, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার হৃদয়ে কখনো নেতৃত্বের লোভ ছিল না। আমি আল্লাহর কাছে কখনো এই নেতৃত্বের জন্য দোয়া করিনি। কিন্তু ফেতনার আশঙ্কা রোধ করতে, বিবাদ-বিশৃঙ্খলাকে দূর করতে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছি।

ভাইসব, আপনারা আমাকে অভিভাবক বানিয়েছেন। আপনাদের সকল দায়িত্ব এখন আমার স্কন্ধে। অথচ আমি আপনাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নই।

আমি যদি ভালো কাজ করি, তাহলে আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। কিন্তু আমি যদি সত্য থেকে বিমুখ হই, পথ চলতে বিভ্রান্ত হই, তাহলে আপনাদের দায়িত্ব হলো আমাকে সঠিক পথ দেখানো। সত্য হলো আমানত, মিথ্যা হলো খেয়ানত।'

আবু বকর রা.-এর ভাষণের এই বাক্যগুলো থেকেই তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

১. খলিফা নির্বাচন কোনো ব্যক্তিগত অধিকারে হয় না।

২. খলিফার আনুগত্য বিনা শর্তে নয়। তার আনুগত্য করা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দৃষ্টিতে ভালো ও বৈধ কাজে।

৩. খলিফা যদি কখনো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথ থেকে বিমুখ হন, তখন তাকে সঠিক পথ দেখানো সকল মুসলমানের ওপর অবশ্যকর্তব্য।

সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর রা. ইসলামের প্রথম খলিফা নিযুক্ত হন। তারপর থেকে এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে তুর্কি খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ পর্যন্ত। তরতর করে সময় বয়ে যায়। পৃথিবীর অমোঘ

নিয়মে চলে যায় ১৩৩১ বছর। সুদীর্ঘ এই সময়ে ১০৩ জন খলিফা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে তাদের মাঝে সকলেই ভালো, উত্তম ও মহান চরিত্র-মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। তাদের মাঝে উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী ও অপেক্ষাকৃত কম ভালো ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল না—এ কথাও বলার সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে যেখানে নক্ষত্রতুল্য মহান মহান ব্যক্তিবর্গ থাকেন, সেখানে কিছু খারাপ ব্যক্তিরও উপস্থিতি থাকে।

এ কথাও বলার সুযোগ নেই যে, খেলাফত সর্বযুগে প্রভাব ও প্রতিপত্তির সাথে, গৌরব ও মর্যাদার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বরং এটাই সত্য যে, কখনো কখনো যেমন মর্যাদার স্বর্ণশিখরে ছিল, তেমনই কখনো দুর্বল, কখনো ভীষণ অসহায় নামসর্বস্ব খেলাফতও ছিল।

মুসলমানদের ইতিহাস বলেই তা মানবিক ইতিহাস থেকে ভিন্ন নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের ঊর্ধ্বে নয়। পৃথিবী হলো উপায়-উপকরণের জায়গা। উপায় ও উপাদানের পরিবর্তন-পরিবর্ধনে পৃথিবীরও পরিবর্তন হয়। কত বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় সেসব সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে গেছে কালের অন্ধকূপে। সারি সারি গাছ ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ ঘন বনভূমি পরিণত হয়েছে ধূ-ধূ মরুভূমিতে।

বিশাল জলরাশিতে উপচে পড়া সাগর পরিণত হয়েছে ফসলের ক্ষেতে। এসব পৃথিবীর নিয়ম, অমোঘ বিধান। কেউ চাইলেই কালের এই বিবর্তন এড়াতে পারে না; পারবেও না। তেমনই খেলাফত কায়েম হবার পর কখনো শক্তিশালী রয়েছে, কখনো কমজোর হয়েছে। তবে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, খেলাফত কখনো নির্জীব ও নির্বিকার রয়েছে। নিষ্ফল ও নিষ্ক্রিয় রয়েছে। খেলাফত সব সময় মুসলমানদের একটি কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করেছে। এবং কিছু না কিছু মানুষ সব সময় জাতিসত্তার ঊর্ধ্বে উঠে খেলাফতকে নিজেদের মারকাজ ভেবেছে। মুসলিম বিশ্বের একমাত্র মারকাজ খেলাফতের মাধ্যমে অনেক কল্যাণকর কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে।

পৃথিবীর যে-কোনো ভূখণ্ডের মুসলমানরা খেলাফতকে যেমন তাদের মারকাজ ভাবত, তেমনই খেলাফতও তাদেরকে উদার হাতে আর্থিক সহযোগিতা দিত। শিক্ষাদীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান দিত। বিনামূল্যে কিতাবাদি প্রদান করত। হাসপাতাল,

সরাইখানাসহ নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতাও দিত। এমনকি হিজরি ১৪ শতাব্দীর শুরুতেও উসমানি খেলাফতের পক্ষ থেকে সুদূর চীনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে। যতদিন খেলাফত ছিল, উসমানি সালতানাত টিকে ছিল, ততদিন খেলাফতের পক্ষ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয়ভার বহন করা হয়েছে। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত লেবানন ও শামে, হেজাজ ও ইরাকে প্রায় বিশটি এদারা খেলাফতের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হতো।.....................................

খেলাফতে রাশেদা

১১–৪১ হিজরি

খেলাফতে রাশেদা

ইসালামের সোনালি যুগ বলা হয় তাকে।

রাসুলের হাদিসের ভাষ্যমতে সবচেয়ে উত্তম, উৎকৃষ্ট ও কল্যাণময় যুগ হলো সাহাবিদের যুগ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদের অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে খেলাফতে রাশেদার সূচনা হয়। রাসুলের সাহচর্যধন্য, গারে সাওরের সঙ্গী, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন খেলাফতে রাশেদা ও মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম খলিফা।

রাসুলের ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য ও বিশ্বসভায় আল্লাহ ও রাসুলের বিধান বাস্তবায়নের জন্য একজন খলিফা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সাককিফায়ে বনু সাইদায় নক্ষত্রতুল্য সাহাবিরা সমবেত হন। উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরস্পর পরামর্শ করে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব তুলে দেন সারওয়ারে কায়েনাতের স্পর্শধন্য আশৈশব বন্ধু হযরত আবু বকরের স্কন্ধে।

কারণ, সাহাবিরা জানতেন উম্মতের মাঝে ইলম, আমল, রাসুলের নৈকট্য, ইসলাম গ্রহণ, দ্বীনের জন্য কুরবানিসহ সকল দিক থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। খেলাফতের গুরুদায়িত্ব লাভের পর তিনি বহুমুখী সমস্যার মুখোমুখি হন। চারিদিকে রিদ্দাহর মহামাররি ছড়িয়ে পড়ে, চতুর্দিক থেকে একের পর এক বিপদ মুসলিম বিশ্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বীরের বেশে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিনা টান করে দাঁড়ান। সকল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

তাঁর শাসনামল ছিল অল্প সময়ের। এরই মাঝে তিনি ইরতিদাদের ফেতনার মোকাবিলা করে রোম-পারস্য অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর হক-বাতিলের চূড়ান্ত পার্থক্যকারী হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বিশ্বের খলিফা হন এবং সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনিন উপাধি গ্রহণ করেন। উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম উম্মাহর মাঝে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরই তাঁর মর্যাদা।

তাঁর দীর্ঘ ১০ বছরের শাসনামলে সমগ্র পৃথিবী মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব অবাক হয়ে দেখতে থাকে।

সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আমর বিন আস, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, মুসান্না বিন হারিসা, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো মহান সেনাপতিদের তলোয়ারের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য। একদিকে মুসলিম বীরদের হাতে বিজিত হতে থাকে নতুন নতুন ভূখণ্ড। আরেকদিকে সেসব ভূখণ্ডে পতপত করে উড়তে থাকে উমরে ফারুকের সাম্য ও ইনসাফের পতাকা।

হযরত উমর রাদি. ছিলেন ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। রাজ্যময় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে, জনগনণের অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে তিনি রাতের আঁধারে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর রাসুলের সাহচর্যধন্য, দুই নুরের অধিকারী, উম্মতের সবচেয়ে লজ্জাশীল ব্যক্তি হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হন।

তাঁর খেলাফতের প্রথম ছয় বছর রাজ্যময় শান্তির সুবাতাস প্রবহমান থাকে। মুসলমানদের বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরবর্তী ছয় বছর দুষ্কৃতিকারীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলে অস্থিতিশীল পরিবেশের অবতারণা হয়। ফলে কোমল, ধৈর্যশীল, উম্মাহর প্রতি দরদি এই খলিফা বিদ্রোহীদলের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

হযরত উসমানের শাহাদতের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁরপর খলিফা হন আল্লাহর সিংহখ্যাত রাসুলের চাচাতো ভাই ও জামাতা হযরত আলি বিন আবু তালিব রা.।

তাঁর শাসনামলে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার কিসাস গ্রহণকে কেন্দ্র করে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ফলে জঙ্গে জামাল ও সিফফিন যুদ্ধের অবতারণা ঘটে। এরই মাঝে খারেজিদের উদ্ভব হয়।

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু খারেজিদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। তারপর রাসুলের কলিজার টুকরা দৌহিত্র, রাসুলের সুগন্ধি বলে অভিহিত হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হন।

তাঁর ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ৪১ হিজরিতে খেলাফতে রাশেদার যুগের সমাপ্তি ঘটে।

খেলাফতে বনু উমাইয়া
৪১-১৩২ হিজরি

খেলাফতে বনু উমাইয়া

ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া খেলাফতের সময়কাল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। উমাইয়া খেলাফতকাল নিয়ে আছে বিস্তর সুআলোচনা, আছে কিছু সমালোচনা-ও। খেলাফতে রাশেদার পর খেলাফতে বনু উমাইয়া গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। গর্ব ও গৌরব লাভের পাশাপাশি বনু উমাইয়ার কাছ থেকে অমার্জনীয় কিছু ভুলক্রটিও প্রকাশ পায়। ফলে উমাইয়া খেলাফত ইসলামের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যধন্য, ওহিলেখক সাহাবি, রাসুলের শ্যালক হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হলেন খেলাফতে বনু উমাইয়ার প্রথম খলিফা। ৪১ হিজরিতে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে উমাইয়া খেলাফতের যাত্রা শুরু হয়।

হযরত মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে দীর্ঘ ২০ বছর খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তিনি তাঁর শাসনামলে জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেন। তিনি রাস্তাঘাট, পুল, সরাইখানা, হাসপাতাল, শহরনগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক। তাঁর ছিল অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষদিকে নানা ফেতনার প্রাদুর্ভাবে মুসলমানদের বিজয়াভিযান থেমে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই নতুন করে বিজয়াভিযান শুরু হয়।

ফলে অল্পদিনের ভেতরেই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে মুসলিম সেনাপতিরা নতুন নতুন ভূখণ্ডে অভিযান চালায়। কেবল তাঁর শাসনামলে মুসলমানরা বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্যে লাগাতার অনেকগুলো আক্রমণ পরিচালনা করে।

উমাইয়াদের যুগকে বলা হয় মুসলমানদের বিজয়ের যুগ। মুসলিম বীরদের হাতে নতুন নতুন অঞ্চল বিজিত হতে থাকে। ইসলামি মানচিত্রে সংযোজন হতে থাকে বিস্তৃত ভূমি। ফলে উমাইয়া খেলাফতকালে ইসলামের উত্থান আর মুসলমানদের বীরত্বের ঝলক অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র পৃথিবী। বিশেষ করে খলিফা মুয়াবিয়া রা. খলিফা আব্দুল মালিক ও ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ও হিশাম বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে মুসলিম বীরসেনানীরা একের পর এক ভূখণ্ডে বিজয়ের ডঙ্কা বাজিয়েছেন।

উমাইয়া খেলাফতকালে একঝাঁক বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী সেনাপতির আবির্ভাব ঘটে। আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ, মুসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ, কুতাইবা বিন মুসলিম, মুহাম্মদ বিন কাসিম, আব্দুর রহমান বিন আসআস ও মুহাল্লাব বিন আবু সুফরাহ, উকবা বিন নাফি ও আব্দুর রহমান আল-গাফেককিসহ অসংখ্য সেনাপতি তাদের তলোয়ারের ডগা দিয়ে পৃথিবীর বুকে অবিশ্বাস্য ইতিহাস রচনা করেন।

ফলে উমাইয়া খেলাফতকালে ইসলামের বিজয়নিশান পৌঁছে যায় বোখারা, সমরকন্দ, ট্রান্সঅক্সানিয়া ও সিন্ধুতে। মুসলমানদের বিজয়ডঙ্কা বেজে উঠে আফ্রিকা, মাগরিব, আন্দালুসিয়া ও পিরিনিজ পর্বতমালার ইথারে ইথারে। খেলাফতে বনু উমাইয়া ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবময়, উজ্জ্বল এক অধ্যায়। বনু উমাইয়ার শাসনামলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে।

উমাইয়া খেলাফতের সময়েই মুসলমানরা বিজয়ের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। পরবর্তী আর কোনো খেলাফতের নেতৃত্বে এত এত ভূখণ্ড বিজিত হয়নি। নতুন নতুন বিস্তৃত ভূমি ইসলামি মানচিত্রের শোভা বর্ধন করেনি। উমাইয়াদের শাসনমালে যেমন–মুসলমানদের শৌর্য ও বীর্য ছিল, শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা ছিল, তথাপি উমাইয়াদের শাসনামলে এমন কিছু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, যা তাদের গৌরবময় ইতিহাসে ঘন কালিমা লেপন করেছে।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ ও উম্মাহর অনৈক্য রোধকল্পে তাঁর ছেলে ইয়াযিদকে তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে

নির্বাচন করে যান। কিন্তু কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।

তিনি ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন যেই উদ্দেশ্যে, পরবর্তীতে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়। ইয়াযিদের খেলাফতকালে তার অধীনস্থ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের বাহিনীর হাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা দৌহিত্র, নবী-তনয়া ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বুকের ধন,জান্নাতের যুবকদের সরদার হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শহিদ হন; ইসলামের ইতিহাসে যা একটি ভীষণ মর্মান্তিক ঘটনা। কারবালার বুকে প্রবহমান এই রক্তস্রোত থেমে থাকেনি। ইয়াযিদের বাহিনী আক্রমণ করে রাসুলের শহর, পবিত্র নগরী মদিনায়। এখানে সংঘটিত হয় ইতিহাসের ন্যক্কারজনক যুদ্ধ হাররা। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর, হাররার যুদ্ধ ছিল বনু উমাইয়ার আরেকটি মহাভুল।

তাদের ভুলের ফিরিস্তি এখানেই থেমে যায়নি, ইয়াযিদবাহিনী ছুটে যায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে মক্কা অবরোধে। পরবর্তীতে খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফতকালে তার নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা অবরোধ করে। হারামের ভেতরে হত্যাযজ্ঞ চালায়। হাজ্জাজের বাহিনী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এটি ছিল বনু উমাইয়ার শাসনামলের আরেকটি জঘন্যতম ঘটনা।

৪১ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত অত্যন্ত শৌর্য-বীর্যের সাথে, সুনাম-সুখ্যাতির সাথে শাসনকারী বনু উমাইয়ার ইতিহাসে কারবালার মর্মান্তিক শাহাদাত, হাররার যুদ্ধ, মক্কা নগরী অবরোধ ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত হলো এমন একটি ক্ষত, যে ক্ষত কখনো শুকাবার নয়। যে বেদনা কখনো ভুলে যাবার মতো নয়।

তথাপি ভালো ও মন্দ নিয়েই মানুষের জীবন। ভালো-মন্দ উভয় দিক বিবেচনা করেই কোনো কিছুর ফয়সালা দিতে হয়।

উপরোক্ত ভুলগুলোর পরেও বনু উমাইয়ার সুনাম ও সুখ্যাতি, সাহস ও শৌর্যের ইতিহাস, ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে উমাইয়াদের অতুলনীয় অবদান ও গৌরবময় অধ্যায় ইতিহাসের পাতায় আজও চিরভাস্বর। আপন স্থানে যথাবিহিত সমাদৃত।

উমাইয়াদের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিল এই যে, তাদের শাসনামলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একজন খলিফার অধীনে শাসিত হতো। খলিফার একটি ফরমান মুহূর্তের মাঝে পৌঁছে যেত আন্দালুস থেকে সিন্ধু, ককেশাস থেকে কাইরাওয়ান পর্যন্ত। পরবর্তী আর কোনো খেলাফতের অধীনে মুসলিম বিশ্ব এভাবে একজন খলিফার নেতৃত্বে শাসিত হয়নি। মুসলমানদের সেই ঐক্য , ইসলামের সেই জৌলুস আর কখনো দেখা যায়নি আলমে ইসলামের চাঁদ-তারাখচিত আকাশে।

বনু উমাইয়ার সর্বশেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় মারওয়ান বিন মুহাম্মদ। ১৩২ হিজরিতে তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে খেলাফতে বনু উমাইয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আব্বাসি খেলাফত

রবিউস সানি। ১৩২ হিজরিতে, আবুল আব্বাস সাফফাহ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাতে আব্বাসি খেলাফতের গোড়াপত্তন হয়। কুফার লোকজন সর্বপ্রথম তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। জিলহজ্জ মাসে মারওয়ানি খেলাফতের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান আব্বাসিদের মোকাবিলায় মিশরে শাহাদতাবরণ করেন। ফলে বনু উমাইয়ার চূড়ান্ত পতন ঘটে। এমনই করে আবুল আব্বাস সাফফাহর খেলাফত, খেলাফতে ইসলামিয়ায় পরিণত হলো।

এ কারণেই ১৩২ হিজরির জিলহজ মাসকে আব্বাসি খেলাফতের গোড়াপত্তনকাল ঘোষণা করা হয়।

আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা

উমাইয়ারা ছিল কুরাইশি। তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের বনু উমাইয়া শাখার ছিলেন না। তিনি ছিলেন বনু হাশিম শাখার।

শুরু থেকেই বনু উমাইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বনু হাশিম

বনু হাশিমের দুটো পরিবারের মাঝে নেতৃত্বের গুণ ছিল, একটি রাসুলের চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার, অন্যটি হলো রাসুলের চাচাতো ভাই ও জামাতা হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার। রাসুলের সাথে এই দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারণে জনগণ এই দুই পরিবারকে অত্যন্ত ভালোবাসত।

এদিকে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ফলে জনগণের একাংশ বনু উমাইয়ার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। রাসুলের সাথে আত্মীয়তার ফলে তারা মনেপ্রাণে কামনা করতে থাকে যে, নেতৃত্ব নবীপরিবারের মাঝে ফিরে আসুক।

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের যে দলটি ছিল তাদেরকে বলা হয় আলাবি। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর আলবিরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধরকে পরবর্তী নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। আরেক দল হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৎভাই মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাকে অধিক যোগ্য মনে করে।

মুফাসসিরদের সরদার হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ছিলেন রাসুলের চাচাতো ভাই। তাঁর ছেলে আলি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি। মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সমাদৃত ও প্রশংসিত। ১১৮ হিজরিতে আরি বিন আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম মুহাম্মদ বিন আলি। তিনিও ছিলেন পিতার মতো যোগ্য। মানুষের কাছে সমাদৃত ও জনপ্রিয়। তিনি বসবাস করতেন হোমাইমা এলাকায়। আলাবি ও আব্বাসিরা উভয়েই বনু উমাইয়াকে ক্ষমতার মসনদ থেকে হটানোর ব্যাপারে একমত ছিল। আলাবিরা বারবার বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ করে। তবে প্রতিবারই তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক্ষেত্রে আব্বাসিরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। তারা কখনো প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। তারা গোপনে ক্ষমতা দখলের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

এদিকে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা ইন্তেকালের পর তার ছেলে আবু হাশিম আব্দুল্লাহ আলাবিদের নেতৃত্ব দেন। আবু হাশিম ছিলেন নিঃসন্তান। জীবনের শেষদিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাকে দায়িত্ব অর্পণ করবেন, এটা নিয়ে বেশ চিন্তত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি চলে আসেন হোমাইমা শহরে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি মুহাম্মদ বিন আলি ছিলেন আবু হাশিমের শিষ্য। ফলে আবু হাশিম মৃত্যুর পূর্বে তার সকল অধিকার ও কর্তৃত্ব মুহাম্মদ বিন আলির কাঁধে অর্পণ করেন এবং তার অনুসারীদেরকে মুহাম্মদ বিন আলির অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন।

এভাবে আলাববিদের বিরাট একটা অংশ আব্বাসিদের সাথে মিশে যায়। তবে তাদের ধারণা ছিল উমাইয়াদের পতনের পর খলিফা আলাবিদের মধ্য থেকেই হবেন।

প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ বিন আলিই ছিলেন আব্বাসি আন্দোলনের রূপকার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। মক্কা-মদিনা বা বসরা-কুফার পরিবর্তে তিনি খোরাসানকে আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন। কারণ উমাইয়াদের মারকাজ দামেশক থেকে খোরাসান ছিল অনেক দূরে। সেখানে তাদের গোপন আন্দোলন চালু রাখা ছিল তুলনামূলক সহজ।

মুহাম্মদ বিন আলি গোপনে নিজেদের পক্ষে জনমত তৈরি করতে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে উমাইয়াবিরোধী আন্দোলন শক্ত রূপ পরিগ্রহ করে। ১২৫ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন আলি ইন্তেকাল করেন।

তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান পুত্র ইবরাহিম বিন মুহাম্মদকে। ইবরাহিম ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। ইবরাহিমের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিল আবু মুসলিম খোরাসানিকে আবিষ্কার করা। আবু মুসলিম ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান, ছিল শক্তিশালী সেনাপতি। ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ তাকে আব্বাসি আন্দোলনের কাজে লাগান। শুরুতেই তিনি নিজের এক শিষ্যের মেয়েকে তার কাছে বিবাহ দেন। পরে তাকে খোরাসানের দায়িত্ব দেন। খোরাসানে আব্বাসি আন্দোলনের পক্ষে দায়িত্বরত পূর্বের প্রতিনিধিদেরকে তিনি আবু মুসলিমের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন।

আবু মুসলিম অল্প সময়ের মাঝেই স্বীয় শক্তিমত্তার প্রমাণ দেয়। সে খোরাসানে বনু উমাইয়া কর্তৃক নির্যাতনের কাহিনি আবেগঘন ভাষায় বলে বলে জনগণকে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে খ্যাপিয়ে তোলে, পাশাপাশি আব্বাসিদের ফজিলত তুলে ধরার জন্য বানোয়াট ও জাল হাদিস তৈরি করে প্রচার করতে থাকে। আবু মুসলিম যুবকদের একটা কাফেলাকে গোপনে যুদ্ধেরও প্রশিক্ষণ দিতে থাকে।

এই পর্যন্ত আব্বাসি আন্দোলন মোটামুটি গোপনীয়তার সাথেই সক্রিয় ছিল। ১২৯ হিজরিতে ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ প্রকাশ্যে আন্দোলনের প্রচারণা চালানোর জন্য পত্রমারফত আবু মুসলিম খোরাসানির কাছে সংবাদ পাঠান। আবু মুসলিম তখন আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে তার বাহিনী নিয়ে খোরাসানের গভর্নর নাসর বিন সাইয়ারের ওপর আক্রমণ করে ও মার্ভ দখল করে। উমাইয়া খলিফা মারওয়ান তখন খারেজিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত থাকায় নাসরকে সহযোগিতা করতে তিনি ব্যর্থ হন।

এরই মাঝে ইমাম ইবরাহিমের একটি পত্র উমাইয়াদের হাতে চলে আসে। ফলে উমাইয়ারা আব্বাসি আন্দোলন সম্পর্কে জেনে যায় এবং ইবরাহিমকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে ইবরাহিম তার ভাই আবুল আব্বাস সাফফাহকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যান।

ততদিনে আবু মুসলিম খোরাসানি অনেক শক্তি অর্জন করে ফেলে। ১৩০ হিজরিতে সে আব্বাসিদের পক্ষে বাইয়াত নিতে শুরু করে। সে তার প্রতিপক্ষদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে থাকে। তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানো প্রত্যেককে সে কচুকাটা করতে থাকে। আব্বাসিরা বনু উমাইয়া-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল উমাইয়াদের জুলুম-নির্যাতনের কারণে। কিন্তু আব্বাসিরা উমাইয়াদের

জুলুমের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজেরাই রচনা করে উমাইয়াদের চেয়ে আরও ভয়ানক জুলুমের রক্তাক্ত দাস্তান।

১৩১ হিজরিতে আবুল আব্বাস সাফফাহর চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কুফা দখল করতে রওনা হন। এ খবর শুনে উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হন। উভয় বাহিনী ১৩১ হিজরির ১১ জুমাদিউস সানি যাব নদীর তীরে মুখোমুখি হয়।

যুদ্ধের পূর্ব থেকেই মারওয়ানের বাহিনীর মনোবল ছিল দুর্বল। ফলে মারওয়ানের বাহিনী পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। মারওয়ান নিজে গিয়ে আশ্রয় নেন হাররান নামক শহরে।

আব্দুল্লাহ বিন আলি তখন হাররান অভিমুখে রওনা হন। মারওয়ান তখন হিমস হয়ে দামেশকে চলে যান। পরে তিনি কতিপয় সঙ্গীসহ চলে যান ফিলিস্তিনের দিকে। এদিকে আব্দুল্লাহ বিন আলি দামেশক আক্রমণ করেন। ১৩২ হিজরির ৫ রমজান রক্তপাতের মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করেন। শহর দখল করেই তিনি তার হৃদয়ের জিঘাংসা চরিতার্থ করেন। শহরের প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। উমাইয়াদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করেন।

তারপর তার কাছে সংবাদ আসে মারওয়ান অবস্থান করছেন মিশরের আবু সির শহরে। আব্দল্লাহ বিন আলির বাহিনী তখন ছুটে যায় আবু সির শহরে। উমাইয়া খেলাফতের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান তখন তাদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন।

এভাবেই উমাইয়াদের জুলুমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আরও জঘন্য জুলুমের রক্তাক্ত দাস্তান রচনার মধ্য দিয়ে আব্বাসি খেলাফতের পদযাত্রা শুরু হয়।

আব্বাসি খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য লোকদের মাঝে আগ্রহ ও চেতনা জাগ্রত করা হয়েছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের প্রতি ভালোবাসার কথা প্রচারণা করে। ফলে আলি রা.-এর বংশধররা এই ক্ষেত্রে আগে আগে ছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল খলিফা তাদের মধ্য থেকেই হবেন। কিন্তু যখন সময় হলো, মারওয়ানিরা পরাজিত হলো, ঠিক তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বংশধররা আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের ব্যক্তিত্ব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে তাদের রক্ত-সম্পর্কতার বিষয়টি লোকদের

সামনে উপস্থাপন করল। খেলাফতের গুরুদায়িত্বের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার সন্তানরাই অধিক হকদার বলে তারা ঘোষণা করল।

বাস্তবে এসব দাবি উত্থাপন ছিল মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। খেলাফতের জন্য তা কোনো বিশেষ ফায়দাজনক ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আত্মীয়তা খেলাফতের মাঝে নতুন কোনো বাস্তবতা সৃষ্টি করতে পারত না। আর স্বয়ং আব্বাস রা. এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-ও কখনো খেলাফতের দাবি করতেন না। কিন্তু পূর্বপুরুষদের ব্যক্তিত্ব বিক্রি করে ফায়দা হাসিল করা মানুষের দুর্বলতায় পরিণত হয়েছিল। যার ফলে আজ পর্যন্ত বাদশাহর ছেলে বাদশাহ এবং পিরের ছেলেই পির হয়।

আব্বাসিদের সফলতা লাভের জন্য আরেকটি কার্যকর পদক্ষেপ ছিল ইরানিদের মাঝে আরব-বিজেতাদের প্রতি বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া। তাদের মাঝে প্রতিশোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেওয়া। সাধারণত বিজেতাদের প্রতি বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে যায়। সময়ের পরিক্রমায় সুযোগ পেলে তারা প্রতিশোধ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

এই ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহা প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাঝে বিদ্যমান থাকে। যখন মারওয়ানি খলিফাদের বিপর্যয় ঘটল, তখন ইরানিরা তাদের হৃদয়ের প্রতিশোধ-আগুন মারওয়ানিদের বিরুদ্ধেই উগড়ে দিল। আব্বাসিরা একদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের দোহাই দিয়ে অন্যদিকে ইরানিদের প্রতিশোধস্পৃহা কাজে লাগিয়ে, তাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে ফেলল।

তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার প্রতি ভালোবাসার দোহাই দিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠা তো করে ফেলেছে। কিন্তু এখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্রদের বংশধররা আব্বাসি খেলাফতের বিরুদ্ধে নিজেদের বংশীয় সম্পর্ককে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। আব্বাসি খলিফা তাদের অগ্নি-উত্তেজনা নির্বাপিত করার শত চেষ্টা করলেও অকৃতকার্য হলো। আলি রা.-এর বংশধররা, যারা খলিফা তাদের মাঝ থেকে হবে ভেবে মারওয়ানি-বিরোধী আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল, তারা তখন স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

ফাতেমা রা.-এর বংশধরেরা খেলাফতব্যবস্থা আব্বাসিদের থেকে নিজেদের কাছে আনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

এমনকি ৪১ বার তারা আব্বাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও অকৃতকার্য হলো। আব্বাসিদের অধীনে দারুল খেলাফত ছিল পর্যায়ক্রমে কুফা, আনবার,

বাগদাদ ও কায়রোতে। কুফা, আনবার ও বাগদাদে পর্যায়ক্রমে ৩৭ জন খলিফা হয়েছেন। আর কায়রোতে ১৭ জন খলিফার হাতে বাইয়াত সংঘটিত হয়েছে।
কায়রোতে আব্বাসিদের সর্বশেষ খলিফা ছিলেন তৃতীয় মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ ।
৯২৩ হিজরিতে তুর্কি সুলতান প্রথম সালিম কায়রো বিজয় করেন।
তখন খলিফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ স্বেচ্ছায় খেলাফত থেকে অব্যাহতি নিয়ে সুলতান সালিমের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।
এমনইভাবে আব্বাসিদের পতনের মধ্য দিয়ে উসমানি খেলাফতের গোড়াপত্তন হয়; যা ১৩৪২ হিজরিতে মুস্তফা কামাল পাশার মাধ্যমে চিরতরে শেষ হয়ে যায়।
আব্বাসি খেলাফতের যুগে, ১৩২ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি পর্যন্ত সময়ের মাঝে চারটি পৃথক খেলাফতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
১) ইদরিসি, পশ্চিম আকসায়; ১৭২ থেকে ৩৭৫ হিজরি।
২) উমাইয়া, আন্দালুসে; ১৩৮ থেকে ৪২২ হিজরি।
৩) ফাতেমি, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে; ২৯৭ থেকে ৫৬৭ হিজরি।
৪) যায়দিইয়া তিবরিস্তানে; ২৫০ থেকে ৩১৬ হিজরি পর্যন্ত।
এই সকল হুকুমত আব্বাসিদেরকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করত না। এমনকি আব্বাসি খলিফাদের বিপরীতে তাদের শাসককে তারা আমিরুল মুনিনিন উপাধিতেই ভূষিত করত।
তবে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন অন্যান্য রাজ্যের শাসকরা কার্যকলাপে আব্বাসি খলিফাদের পরোয়া না করলেও মুখে মুখে আব্বাসি খেলাফতের অধীনতা স্বীকার করত। এমনকি কোনো কোনো শাসক এই পরিমাণ অনুগত ছিলেন যে, আব্বাসি খলিফার পক্ষ থেকে নির্দেশনামা না আসা পর্যন্ত এবং লোকদের সামনে তা পাঠ করে শোনানোর আগ পর্যন্ত সিংহাসনে আরোহণ করতেন না।
তারা খলিফা কর্তৃক বিশেষ পোশাক না আসা পর্যন্ত নিজেকে সাধারণ মানুষ বলেই গণ্য করতেন। এর মাধ্যমে তারা আনুগত্য প্রকাশের সাথে সাথে জনগণকে এটাই বোঝাতেন যে, তিনি স্বয়ং খলিফার পক্ষ থেকেই নির্বাচিত। তিনি খলিফার হুকুমই বাস্তবায়িত করছেন।

আমিরুল মুমিনিন **আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.**

(আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদি. উমাইয়া খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর খেলাফতের সময়ের ধারাবাহিকতায় তাঁর জীবনি এখানে উল্লেখ করা হলো।)

জন্ম: ১ম হিজরি

খেলাফত: ৬৪ হিজরি

শাহাদাত: ৭৩ হিজরি

প্রাথমিক পরিচিতি

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর বিন আওয়াম বিন খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযা বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররা। তার উপনাম ছিল আবু খুবাইব, আবু বকর। তার পিতা ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির অন্যতম, রাসুলের হাওয়ারি ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.। তার মাতা প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর আদরের কন্যা, দুই কমরবন্দওয়ালী উপাধিতে খ্যাত আসমা বিনতে আবি বকর রা.। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. প্রথম হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর মদিনায় জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু তিনি। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাহনিক করান। ধরায় তার শুভাগমনে মদিনার মুসলমানদের মাঝে আনন্দের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

কারণ, মুখে মুখে অনেকেই তখন মুসলমানদেরকে বলত, 'ইহুদিরা তোমাদেরকে যাদু করেছে। তোমাদের আর কোনো সন্তান হবে না।'[১]

ফলে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের জন্ম হলে তার নানা হযরত আবু বকর তাকে কোলে করে পুরো মদিনায় ঘুরে বেড়ান। যাতে ইহুদিদের প্রচার করা মিথ্যা দাবির অসারতা সবার সামনে প্রকাশিত হয়।[২]

---

১ সহিহ বুখারি : ৫৪৬৯

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/১৮৮

স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। তার বয়স যখন সাত বা আট হয়, তখন রাসুলের হাতে তিনি বায়াত গ্রহণ করেন।[৩]

ইলম

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স দশ বছর। তিনি প্রখর মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। যার ফলে দেখা যায় অল্প বয়সি হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বুখারি মুসলিমে তার হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি মোট ৩৩ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ছিলেন মক্কা-মদিনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। ছিলেন অনেক বড়ো মুজতাহিদ। তিনি কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে অত্যন্ত গভীর জ্ঞান রাখতেন। পিতা যুবাইর, নানা আবু বকর, খালা হযরত আয়েশা ছিলেন তার শিক্ষক। উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ফকিহা আয়েশা রা.-এর ঘরে তিনি লালিত-পালিত হন। খালা আয়েশার ঘরে তিনি সব সময় যাওয়া-আসা করতেন। আয়েশা তাকে নিজের সন্তানের মতো দেখাশোনা করতেন। ফলে ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. ছিলেন আরবের অন্যতম ফকিহ।[৪]

বীরত্ব

হযরত আব্দুল্লাহ ছিলেন অসম সাহসী, শ্রেষ্ঠ বীর ও বাহাদুর সৈনিক। ছিলেন পিতা যুবাইরের মতো জানবাজ লড়াকু ও মুজাহিদ।

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসের আধার। খন্দকের যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল পাঁচ বছরের মতো। এই বয়সে কোনো শিশুর সাধারণত যুদ্ধের দৃশ্য দেখার মতো সাহস থাকে না। অথচ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এক টিলায় আরোহণ করে নির্ভয়ে আগ্রহ নিয়ে এই যুদ্ধের দৃশ্য অলোকন করেন।

একবার তিনি শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে শিশুদের ভড়কে দেবার উদ্দেশ্যে ঠাট্টার ছলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। খেলার সাথিরা ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে যায়। কিন্তু শিশু আব্দুল্লাহ তখন নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি তার সাথিদেরকে বলেন, তোমরা আমাকে আমির বানাও। তারপর সবাই মিলে তার ওপর হামলা করব। শিশুরা তার কথা মেনে একযোগে ওই লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

---

৩ আল-হাকিম : ৩/৫৪৮

৪ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ৫২

হযরত উমর ছিলেন কড়া মেজাজের, গম্ভীর প্রকৃতির প্রতাপশালী মানুষ। তার সামনে বাচ্চাদের দুষ্টুমি করার কোনো জোঁ ছিল না। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিলেন, এমন সময় হযরত উমর এলেন। শিশুরা সবাই উমর রা.-কে দেখে দৌড়ে চলে যায়। কিন্তু আব্দুল্লাহ তার আপন জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। হযরত উমর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেন পালালে না?

আবদুল্লাহ নিঃসংকোচে উত্তর দেন, আমি তো কোনো অপরাধ করিনি যে পালাব। আর রাস্তা তো সংকীর্ণ নয় যে আপনার জন্য সরে দাঁড়াব।

হযরত উমর আব্দুল্লাহর সাহস দেখে অভিভূত হন এবং হাসতে হাসতে চলে যান।[৫] শিশু আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের এই সাহস পরবর্তীতে তার পুরো জীবনের পরতে পরতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। হযরত আবু বকরের খেলাফতের শেষ সময়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. তার পিতার সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল কম। মুশরিকরা যখন ময়দানে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, শিশু আব্দুল্লাহ তখন আহতদের সেবা-শুশ্রূষায় অংশগ্রহণ করেন।[৬] হযরত উসমান রা.-এর শাসনামলে ২৬ হিজরিতে সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ রা. আফ্রিকা বিজয়ের পথে পা বাড়ান। আফ্রিকায় তখন শাসন করছিল খ্রিষ্টান রাজা জারজিরর। জারজিরর ছিল প্রখ্যাত একজন সেনাপতি। ছিল বীর ও বাহাদুর।

মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে সে এক লাখ বিশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক কম। মাত্র দশ হাজার বা বিশ হাজার।

এই স্বল্প সৈন্য নিয়ে মুসলমানরা জারজিররের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই করলেও বিজয় লাভ করা তাদের জন্য সুদূরপরাহত হয়ে ওঠে।

এভাবে অনেক দিন চলে যায়। মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সাহসে ভাটা পড়তে থাকে। ঠিক এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর একটি কাফেলার নেতৃত্ব দিয়ে মদিনা থেকে উল্কার বেগে ছুটে আসেন। এই বাহিনীতে হাসান, হোসাইন, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা.-ও ছিলেন।

নতুন বাহিনী দেখে মুসলমানদের স্পৃহা ও সাহস বেড়ে যায়। ফলে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের বুদ্ধি, বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে জারজিরর পরাজিত হয়। আব্দুল্লাহ

---

৫ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ৫৩, ৫৪

৬ তারখু ইবনি আসাকির : ৪১

বিন যুবাইর ময়দানে পৌঁছেই যুদ্ধের সার্বিক অবস্থার খোঁজ নেন। তিনি বুঝতে পারেন এই অল্প সৈন্যসংখ্যা দিয়ে জারজিররকে পরাজিত করা মোটেই সহজ হবে না। তাকে পরাজিত করতে হবে কৌশল দিয়ে। ফলে তিনি নতুন পরিকল্পনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন সাদের কাছে নিজের পরিকল্পনা এভাবে পেশ করেন যে, পরদিন মুসলমানদের একাংশ লড়াই করবে, আর একাংশ তাঁবুতে বিশ্রাম করবে। যুদ্ধ যখন থেমে যাবে, খ্রিষ্টানরা নিস্তেজ হয়ে তাঁবুতে ফিরবে, তখন আমাদের তাঁবুতে বিশ্রাম করা তাজাদম বাহিনী শত্রুর ওপর আক্রমণ করবে। আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ রা.-সহ সকলের কাছে এই অভিমত পছন্দ হয়।

পরদিন যখন যুদ্ধ শুরু হয়, মুসলমানদের একাংশ বীরবিক্রমে খ্রিষ্টানদের সাথে লড়াই করে। আরেকাংশ তাঁবুতে বিশ্রাম করে। আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। দুপরের পর যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে ক্লান্তদেহে তাঁবুতে ফিরে গেল, তখন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর তাজাদম বাহিনী নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেনাপতি জারজিরর ইবনে যুবাইরের এই আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। জারজিরর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের হাতে নিহত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পর পুরো আফ্রিকাজুড়ে একের পর এক অভিযান চলে। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. সেসব অভিযানে বীরত্ব ও বাহাদুরির স্বাক্ষর রাখেন।[৭]

হযরত উসমান রা.-এর ওপর যখন বিদ্রেহীরা আক্রমণ করে তখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে একদা তিনি তার ভাষণে বলেন, আমি প্রায় দশবার আহত হয়েছি। উসমান রা.-কে রক্ষা করতে গিয়ে আমার শরীরে যে ক্ষতগুলো হয়েছিল, আমি আজও সেসব ক্ষতস্থানে হাত বোলাই। আমি আশা করি, এগুলো আল্লাহর কাছে আমার শ্রেষ্ঠ আমল বলে পরিগণিত হবে।

হযরত আলি রা.-এর শাসনামলে সংঘটিত জঙ্গে জামালে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর অংশগ্রহণ করেন। এখানেও তিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। যুদ্ধ শেষে দেখা যায়, তার শরীরে ৪০ টি, মতান্তরে ৭০ টি আঘাত রয়েছে।[৮]

হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে মুয়াবিয়া বিন খোদাইজ আফ্রিকা অভিযানে বের হন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর আফ্রিকা অভিযানে মুয়াবিয়া বিন

---

৭ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ৫৮-৬৪, আবতালুল ফাতহিল ইসলামি : ৯১-৯২

৮ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ৫৮

খোদাইজের ডান হাতের ভূমিকা পালন করেন। মুয়াবিয়া বিন খোদাইজ তাকে একটি বাহিনী দিয়ে সুসা অভিমুখে প্রেরণ করলে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর সুসা বিজয় করেন।

মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে যখন মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে তখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরও সেই বাহিনীতে ভরপুর অংশগ্রহণ করেন।[৯] ইয়াযিদের শাসনামলে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ইয়াযিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। হোসাইন রা.-এর হত্যার পর তিনি ইয়াযিদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন।

ফলে ইয়াযিদের সেনাপতি মুসলিম বিন উকবা হাররার ঘটনার পর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। পথিমধ্যে সে মৃত্যুবরণ করলে হোসাইন বিন নুমাইর তার স্থলাভিষিক্ত হয়। মহররমের ২৬ তারিখ সে মক্কার উপপ্রান্তে পৌঁছে। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর মক্কা শহর থেকে বের হয়ে তার মোকাবিলা করেন। কিন্তু লড়াইয়ে ইয়াযিদ বাহিনীর পাল্লা ভারী হওয়ায় তিনি মক্কায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ফয়সালা করেন। হোসাইন বিন নুমাইরও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে অবরোধ করে। রবিউল আউয়ালের তিন তারিখ সে আবু কাইস ও কাইকায়ান পাহাড়ে মিনজানিক স্থাপন করে মক্কার অভ্যন্তরে পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। অবরোধের দিনগুলোতে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দেন।[১০]

এদিকে ১৪ই রবিউল আউয়াল ইয়াযিদের ইন্তেকাল হয়। তার মৃত্যুসংবাদ মক্কায় আসতে অনেক দেরি হয়। অবশেষে ৬৪ হিজরির রবিউল উখরার চাঁদ উঠলে তার মৃত্যুসংবাদ মক্কায় আসে।[১১]

খলিফার মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র হোসাইন বিন নুমাইর অবরোধ উঠিয়ে নেয়। ইয়াযিদ বাহিনী সর্বমোট ৬৪ দিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে অবরোধ করে রাখে।[১২]

তার বায়াত

মারওয়ান ও আব্দুল মালিকের অবস্থান

---

৯ মাহমুদ শাকির কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ৪৩

১০ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ১৪৩, ১৪৪

১১ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ১৪৮, আখবারু মাক্কা : ১/১৯৭

১২ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ১৪৯, ১৪৭

ইয়াযিদ মৃত্যুর পূর্বে তার ছেলে মুয়াবিয়াকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. শুরু থেকেই চাচ্ছিলেন খলিফা নির্বাচনের এই রাজতন্ত্রীয় ধারার পরিসমাপ্তি হোক। মুসলিম বিশ্বে একমাত্র শূরার মাধ্যমে খলিফা নির্বাচন হোক। এদিকে মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদের সময়কাল ছিল অল্প। তিনি সৎ ও নেককার ব্যক্তি হওয়ায় তিনিও চাচ্ছিলেন খলিফা নির্বাচনের ধারা শূরায়ি নেযামে ফিরে আসুক। উম্মাহ তাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই খলিফা নির্বাচিত করুক। ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাস পর মুয়াবিয়া ইন্তেকাল করলে, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন। দেখতে দেখতে হেজাজ, ইরাক, মিশর, ফিলিস্তিন, কিন্নাসিরিনসহ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের নামে বায়াত সংঘটিত হয়। মুসলিম বিশ্বে তার বায়াত সম্পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তিনি শরয়ি খলিফা নির্বাচিত হন।[১৩]

কিন্তু ইসলামি মানচিত্রের অধিকাংশ এলাকা যখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের আনুগত্য গ্রহণ করে। ঠিক তখন মারওয়ান বিন হাকাম শামে গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের পক্ষের লোকদেরকে মারজরাহিত নামক যুদ্ধে পরাজিত করে শামে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারপর সে মিশরে অভিযান চালায়। সে মিশরে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পরাজিত করে ৬৫ হিজরিতে মিশর অধিকৃত করতে সক্ষম হয়।

মিশর থেকে ফিরে এসে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের কাছ থেকে ইরাক ও হেজাজ দখল করার মানসে দুটি বাহিনী পাঠায়। কিন্তু এরই মাঝে সে মৃত্যুবরণ করে। মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার ছেলে আব্দুল মালেক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শামের লোকেরা তার হাতে বায়াত হয়। এরপর শামবাসী ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের মাঝে দীর্ঘ লড়াই অব্যাহত থাকে।

দেখতে দেখতে একেকটি এলাকা ইবনে যুবাইরের হাত থেকে ছুটে যেতে থাকে। ৭১ হিজরিতে পুরো ইরাকে আব্দুল মালেকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। ৭২ হিজরিতে আব্দুল মালেক মক্কায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে অবরোধ করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে নির্দেশ দেয়।[১৪]

হাজ্জাজ তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ইবনে যুবাইরকে মক্কায় অবরোধ করে। আবু কুবাইস পাহাড়ে মিনজানিক স্থাপন করে পাথর বর্ষণ শুরু করে। কেবল এতেই সে

---

১৩ সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৭৩

১৪ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ২৪১-৪২

ক্ষান্ত হয়নি। সে মক্কার অভ্যন্তরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়। ফলে কাবা শরিফ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার বাহিনীর পাথর ও গোলা নিক্ষেপের কারণে হাজিরা হজ পালনে বাধাগ্রস্ত হলে, ইবনে উমরের আবেদনে সে আক্রমণ বন্ধ রাখে। হজের মৌসুম শেষে আবার সে জোরেশোরে আক্রমণ চালায়। সে এমনভাবেই অবরোধ জারি রাখে যে, মক্কায় কোনো খাবার প্রবেশ করতে পারে না। একপর্যায়ে লোকেরা ঘোড়া জবাই করে খেতে থাকে। মক্কায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। মক্কার মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা ধীরে ধীরে ইবনে যুবাইরের পাশ থেকে সরে যেতে থাকে। অল্প দিনের মাঝে ১০ হাজার মানুষ ইবনে যুবাইরকে ছেড়ে চলে যায়।[১৫] আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। হাজ্জাজ তাকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু উঁচু মাপের আত্মমর্যাদাশীল আব্দুল্লাহ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নামে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন। তিনি শামের বাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে ৭৩ হিজরির জুমাদিউল উখরার শেষভাগে মঙ্গলবার দিন হাজ্জাজের বাহিনীর হাতে শাহাদাতবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৭৩ বছর।[১৬]

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে হত্যা করার পরেও হাজ্জাজ তার দেহ শূলিতে চড়িয়ে তার বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করে। সুবহানাল্লাহ! একদিকে যখন জালিম হাজ্জাজ তার চূড়ান্ত জুলুমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছিল, অন্যদিকে মজলুম ইবনে যুবাইরের লাশ থেকে তখন মিশকে আম্বরের সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল।[১৭]

আল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

---

১৫ তালেব হাশেমি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ২৪৪-৪৫, আল-খুরাশি কৃত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর : ১৯০

১৬ আল-কামিল ফিত তারিখ : ৩/৭৩

১৭ আল-কামিল : ৩/৭৪